মোহাম্মদ গোলাম নবী

উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষায় সরকার ও এনজিওর কাজের সমন্বয় দরকার

মানবসম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রথম শর্তই হল প্রাথমিক শিক্ষা। যে কারণে সংবিধানে শিক্ষাকে সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করে জাতিকে নিরক্ষরমুক্ত করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের ওপর অর্পণ করা হয়েছে। এ দায়িত্ব সফলভাবে পালনের জন্য সরকারের দিক থেকে আন্তরিকতার অভাব নেই। 'সবার জন্য শিক্ষা'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শতভাগ ভর্তি ও প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন নিশ্চিত করা দরকার। এ লক্ষ্যে সরকার প্রাথমিকের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান করছে, তাদের বিনামূল্যে বই দিচ্ছে, এ ছাড়াও স্কুল ফিডিং কর্মসূচি, শিক্ষার্থীদের বাড়ি পরিদর্শন, মা সমাবেশ ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এর ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ার হার ইতিমধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে তবে পুরোপুরি বন্ধ হয়নি। প্রথমত দারিদ্র্য এবং সেই সঙ্গে নদী ভাঙন, পরিবারের স্থানান্তর, বাড়ি থেকে স্কুল দূরে হওয়া ইত্যাদি নানাবিধ কারণে স্কুলে ভর্তি হওয়া শিশুরা প্রাথমিক শিক্ষাচক্র প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত সমাপ্ত না করেই স্কুল থেকে ঝরে পড়ছে। সাম্প্রতিককালে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রকাশিত 'প্রাথমিক শিক্ষায় পাঁচ বছরের অর্জন ২০০৯-২০১৩' শীর্ষক প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, স্কুলে ভর্তির হার প্রায় ৯৬.৭০ শতাংশ হলেও প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সমাপ্তির হার মাত্র ৭৩.৮০ শতাংশ। অর্থাৎ প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রায় ২৬ ভাগ শিক্ষার্থী পঞ্চম শ্রেণীর লেখাপড়া শেষ করার আগেই স্কুল থেকে ঝরে পড়ে। এত গেল দেশের প্রাথমিক শিক্ষার একটি দিক।

আরেকটি দিক হল স্কুলে গমনোপযোগী শিশুদের স্কুলে ভর্তি না হওয়া। পরিসংখ্যান মতে, স্কুলে যাওয়ার বয়সী প্রায় চার শতাংশ শিশু স্কুলে ভর্তিই হচ্ছে না। এটা সরকারি হিসাব। বেসরকারি হিসাবে সংখ্যাটি আরও অনেক বেশি। যেমনিভাবে সরকারি হিসাবে ঝরে পড়ার হার ২৬ শতাংশ হলেও বেসরকারি হিসাবে এই হার ৪০ শতাংশের বেশি। শিশুদের স্কুল থেকে ঝরে পড়া কিংবা স্কুলে ভর্তি না হওয়ার এই চিত্রটি একটি দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য মোটেই ইতিবাচক নয়। বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে সরকার প্রাথমিক শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়ন এবং স্কুলে গমনোপযোগী সব শিশুকে স্কুলের আওতায় এনে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নয়টি উন্নয়ন সহযোগী দাতাসংস্থার অর্থায়নে বৃহৎ আকারের সেক্টরওয়াইড প্রোগ্রাম তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি বা পিইডিপি-৩ গ্রহণ করেছে। এই কর্মসূচির আওতায় শতভাগ শিশুকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করাসহ ঝরে পড়া কমানোর ওপর জোর দেয়া হয়েছে। তাছাড়া শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে উন্নীত করাও এ কর্মসূচির লক্ষ্য।

সরকারের বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ থেকে এটা স্পষ্ট যে, সরকার মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানে বদ্ধপরিকর। স্কুলে শিশুবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের স্কুলে ধরে রাখার মাধ্যমে সরকার প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সমাপনকারীর সংখ্যা বাড়াতে চায়। তবে অভিজ্ঞতা থেকে এ কথা বলা যায় যে, সরকারের সব ধরনের চেষ্টার পরও বাস্তব কারণেই সরকারিভাবে সব শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন আগামী দু-চার-দশ বছরে নিশ্চিত করা যাবে না। কারণ যারা ইতিমধ্যে ঝরে পড়েছে কিংবা আগামী দু-চার-পাঁচ বছরে ঝরে পড়বে তাদের শিক্ষার আওতায় আনা এবং নতুন করে ঝরে পড়া বন্ধ করতে অন্তত দুই দশক লেগে যাবে। এ অবস্থায় যতদিন পর্যন্ত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শতভাগ ভর্তি এবং প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সমাপন নিশ্চিত করা সম্ভব না হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত যে শিশুরা স্কুলের বাইরে আছে, যারা স্কুল থেকে ঝরে পড়েছে কিংবা কখনও স্কুলেই যায়নি তাদের জন্য শিক্ষার বিকল্প ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ এই দেশের প্রতিটি শিশুই রাষ্ট্রের ভবিষ্যতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

প্রসঙ্গত, সরকারিভাবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার বয়স ছয় বছর। এ বয়সে যারা স্কুলে ভর্তি হয় না কিংবা ভর্তি হলেও এক-দুই বছর স্কুলে যাওয়ার পর ঝরে পড়ে, তাদের প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে এনজিওরা কাজ করছে। এনজিও পরিচালিত উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক স্কুলগুলোতে ৮ থেকে ১৪ বছর

> যতদিন পর্যন্ত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শতভাগ ভর্তি এবং প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সমাপন নিশ্চিত করা সম্ভব না হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত যে শিশুরা স্কুলের বাইরে আছে, যারা স্কুল থেকে ঝরে পড়েছে কিংবা কখনও স্কুলেই যায়নি তাদের জন্য শিক্ষার বিকল্প ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ এই দেশের প্রতিটি শিশুই রাষ্ট্রের ভবিষ্যতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

বয়সী শিশুরা লেখাপড়া করে। অতীতে এনজিওরা তাদের স্কুলগুলোতে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার করলেও এখন তারা জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রণীত কারিকুলাম অনুসরণ করেই লেখাপড়া করায়। সরকার বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ নীতিমালার আওতায় এনজিওদের বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করে থাকে। এর ফলে এনজিও স্কুলের শিক্ষার্থীরাও প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা পিএসসিতে (প্রাইমারি স্কুল সার্টিফিকেট) অংশ নিতে পারছে। এনজিও স্কুলগুলোর পিএসসির ফলাফল সরকারি স্কুলের ফলাফলের প্রায় অনুরূপ। যেমন, গত বছর এনজিও পরিচালিত পেয়ার শিক্ষা কর্মসূচির ইউনিক টু প্রকল্পের শিক্ষার্থীদের পাসের হার ছিল ৯৯.৪৪ শতাংশ, যা জাতীয় গড় ৯৮.৪৬ শতাংশের চেয়েও বেশি। অন্যদিকে ঢাকা ও চট্টগ্রামের বস্তিতে পরিচালিত পেয়ারের সাসটেইন প্রকল্পভুক্ত কর্মজীবী শিশুদের ৯৩ শতাংশ কৃতিত্বের সঙ্গে পাস করেছিল। পিছিয়ে ছিল না দেশের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর শিশুদের শিক্ষার জন্য নিয়োজিত পেয়ারের আদোঘর প্রকল্পের শিশুরাও, তারাও পিএসসিতে ৯২ শতাংশের বেশি পাস করেছে। উল্লেখ্য, পেয়ার শিক্ষা কর্মসূচি দেশের ৪৭টি জেলার ২১৯টি উপজেলায় কাজ করছে। প্রায় তিন লাখ শিক্ষার্থী পেয়ারের স্কুলগুলোতে লেখাপড়া করছে। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অর্থায়নে পরিচালিত পেয়ার শিক্ষা কর্মসূচি মূলত দেশের সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের কাছে প্রাথমিক শিক্ষা পৌঁছে দিচ্ছে। দেশে পেয়ার শিক্ষা কর্মসূচি ছাড়াও এনজিও পরিচালিত আরও অনেক প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প রয়েছে যারা সম্মিলিতভাবে দেশের স্কুলগুলো থেকে ঝরে পড়া কিংবা কখনও স্কুলে যায়নি এমন শিশুদের কাছে আন্তরিকতার সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা পৌঁছে দিচ্ছে।

সাম্প্রতিককালে সরকার শিক্ষার প্রতি শিশুদের আগ্রহী করে তুলতে এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বাড়াতে এবং ঝরে পড়া রোধ করতে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু করেছে। এই কার্যক্রমের মাধ্যমে একটি শিশু আনুষ্ঠানিক শিক্ষার জগতে প্রবেশের আগে প্রয়োজনীয় শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, ভাষাগত ও সামাজিক দক্ষতা অর্জন করে। পেয়ার শিক্ষা কর্মসূচির মতো এনজিও পরিচালিত অন্যান্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচিতেও এই ধরনের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রয়েছে। যার মাধ্যমে এনজিওরা সরকারি স্কুলে শিশু ভর্তিতে অবদান রাখছে। এ ছাড়াও পেয়ারের মতো উপানুষ্ঠানিক কর্মসূচির মাধ্যমে এনজিওরা সরকারি প্রাথমিক স্কুলপড়ুয়া লেখাপড়ায় পিছিয়ে থাকা শিশুদের কোচিংয়ের ব্যবস্থা করে থাকে, যাতে করে তারা অগ্রগামী শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সমানতালে লেখাপড়া করতে পারে।

এভাবেই এনজিওরা সরকারের সহায়ক শক্তি হিসেবে সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নে কাজ করছে। এনজিওরা যখন কোনো একটি এলাকায় উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক স্কুল চালু করতে যায়, তখন প্রথমে ওখানকার সরকারি প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলে স্কুলের চাহিদা আছে কিনা যাচাই করে। এরপর প্রধান শিক্ষকের কাছ থেকে তার স্কুল থেকে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের এনজিও স্কুলে ভর্তির ব্যাপারে তার অনাপত্তি পত্র নেয়। এরপর উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার সঙ্গে আলোচনা করে। এভাবে সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এবং স্থানীয় জনগণের সহায়তায় এনজিওরা দেশের চর, হাওর, পাহাড়ি এলাকা, বস্তিসহ দুর্গম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে উপানুষ্ঠানিক স্কুল চালু করে। অভিজ্ঞতা থেকে আমরা বলতে পারি যে, স্থানীয় পর্যায়ে এনজিওদের সঙ্গে সরকারের দফতরগুলোর কাজের এক ধরনের সমন্বয় আছে। কিন্তু জাতীয় পর্যায়ে একই ধরনের সমন্বয় না থাকায় এবং সুস্পষ্ট নীতিমালার অভাবে এবং স্থানীয় পর্যায়ের শিক্ষা দফতরের স্থানীয় শিক্ষার ব্যাপারে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা না থাকায় উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষায় নিয়োজিত এনজিওদের নিজেদের মধ্যে এবং সরকারের সঙ্গে এনজিওদের কাজের সমন্বয়হীনতা প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়, যা শিশু শিক্ষার্থীদের বিশেষ করে সুবিধাবঞ্চিত পরিব শিশুদের লেখাপড়ায় বিরূপ প্রভাব ফেলছে। এ অবস্থার অবসানে সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কার্যকর পদক্ষেপ নিয়ে এগিয়ে আসা দরকার।

মোহাম্মদ গোলাম নবী : *যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ, পেয়ার শিক্ষা কর্মসূচি*
gnabi1969@yahoo.com